নওগাঁ জেলা

মেজর নাজমুল হক শাহাদৎ বরণ করেন

১৯৭১ সালের ২৮ এপ্রিল হাটশারল বিওপি ক্যাম্পে নাজমুল হুদার নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা আমার নানা মো. আবু বক্কার সিদ্দিক অংশগ্রহণ করেন। তিনি যখন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তখন তাদের সাথে মোট ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। সেখানে তিনি এক সপ্তাহ রাইফেল খোলা ও জোড়া এবং চালানোর প্রশিক্ষণ পেলেন। তারপর সাপাহার থেকে পাকসেনারা ওই ক্যাম্পে অতর্কিতভাবে হামলা করে। তারা এ হামলা বীরত্বের সাথে প্রতিহত করে ওই ক্যাম্প ছেড়ে ভারতের পারুলা ক্যাম্পে অবস্থান নেন। সেখানে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় আনুমানিক এক কিলোমিটার পশ্চিমে সাদুল্লাপুর গ্রামে তালপুকুরের দক্ষিণ দিকে অপারেশন ক্যাম্প স্থাপন করেন। ঐদিন বেলা চারটায় বাংলাদেশের খনজনপুর থেকে পাকসেনারা একটা বিশাল আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধারাও পাকসেনাদের ওপর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ করে এবং এই যুদ্ধে তাদের মধ্যে নিয়ামতপুর থানার তালপুকুর গ্রামের এক মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। তার বয়স আনুমানিক ২০-২২ বছর। তিনি আরও বললেন যে, এই যুদ্ধে পাকসেনাদের ১২ জন সৈন্যকে অক্ষত অবস্থায় আটক করেন মুক্তিযোদ্ধারা। বহু অস্ত্র, গোলা-বারুদ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে সাপাহার হাইস্কুলে পাকসেনাদের যে ক্যাম্প ছিল তা দখল করার জন্য ১০০ মুক্তিযোদ্ধা রাত তিনটায় ওই ক্যাম্পে আক্রমণ করেন। দশ ঘণ্টাব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। সেই সময় নজিপুর থেকে ৩০০ পাকসেনা এসে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে ফেলে। সেই যুদ্ধে বারোজন মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাত বরণ করেন। এগারোজন পাকসেনা অক্ষত অবস্থায় ধরা পড়ে মুক্তিসেনাদের হাতে। পাকসেনারাও ছয়জন মারা যায়। বাকি মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা গুলিবিদ্ধ হলেন। স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় আহত মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতে চিকিৎসা করানো হয়। এই যুদ্ধের খবরাখবর পেয়ে তদানীন্তন ৭নং সেক্টর কমান্ডার মেজর নাজমুল হক দ্রুত বেগে অপারেশন ক্যাম্পে আসার পথে এক গাছের সঙ্গে গাড়ির ধাক্কা খেয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে পত্নীতলা থানার মাধইল বাজারে এক হাই স্কুলে পাকসেনাদের ক্যাম্প ছিল। সেই ক্যাম্পে প্রায় ২০০ পাকসেনা ছিল। ভারত থেকে আগরাদুকুল হয়ে ৩০০ মুক্তিযোদ্ধা তিন দিক থেকে মাধইলে পাকসেনাদের ক্যাম্প আক্রমণ করল। সেই যুদ্ধ আনুমানিক ১২ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের এক বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়। প্রায় ৩০-৪০ জন পাকসেনা ঘটনাস্থলে মারা যায়। বাকি পাকসেনারা গুলি করতে করতে নজিপুর পার হয়ে চলে যায় এবং আশপাশের গ্রামগুলোর বহু লোকজন পাকসেনারা হত্যা করে চলে যায়। সেই যুদ্ধে পাকসেনাদের হালকা এবং ভারী বহু অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে।

এটা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরাট সাফল্য। এরপর থেকে ওই এলাকাটি মুক্ত অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সাপাহার থানার পাড়িপুকুর গ্রামে বাহিমজল রাজাকারের সঙ্গে প্রচণ্ড গুলি বিনিময় হয়। এই যুদ্ধে রাজাকারদের সম্পূর্ণ নির্মূল করে দেয়া হয় এবং রাজাকারদের যে সমস্ত অস্ত্র, গোলা-বারুদ ছিল সব মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। এই খবর পেয়ে নিতপুর এবং সরাইগাছি যে সমস্ত পাকসেনা ছিল তারা রাতের অন্ধকারে অস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায়। এরপরে পোরশা এবং সাপাহার থানা সম্পূর্ণ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ১২ জন রাজাকার গোপনে পোরশা থানার মোহাডাঙ্গা গ্রামে মাইনুল চেয়ারম্যানের বৈঠকখানায় একটি ক্যাম্প স্থাপন করে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ২০ জন মুক্তিযোদ্ধা অতর্কিত আক্রমণ করে। কয়েক ঘণ্টা ধরে গুলি বিনিময় হয়। এই যুদ্ধে একজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন এবং রাজাকার বাহিনী নির্মূল হয়ে যায়। এরপরে তাদের অস্ত্র, গোলা-বারুদ সবকিছু মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ওই এলাকাটা মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণ দখলে আসে।

সূত্র; জ- ১১৭৫৭

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
তানজিলা খাতুন	**মো. আবু বক্কর সিদ্দিক (মুক্তিযোদ্ধা)**
বালিয়াচান্দা উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : খেদ্দেহরীপুর, পোস্ট : বালিয়াচান্দা
দশম শ্রেণি, রোল : ০১	থানা : পোরশা, জেলা : নওগাঁ
	সম্পর্ক : নানা

আগুন দেখে হাজি সাহেব মারা গেলেন

আমার মা বললেন মুক্তিযুদ্ধে নওগাঁর করুণ কাহিনি। তখন তিনি নববধূ। তার বয়স ছিল ১২ বছর। যুদ্ধের মাঝখানের সময়টা। তখন আমাদের গ্রামে হামলা করে পাকসেনারা। তখন দাদি বললেন, আমরা কোতাই নুকে থাকি। দিশা-বিশা না পেয়ে দৌড় দিল। মা নাকি যেই দিকে যাচ্ছিল সেই দিক থেকে পাকসেনারা আসছিল। তাই আবার দৌড় দিল। কখনো মা প্রাণের ভয়ে পানিতে ঝাঁপ দিতে চায়। মা'দের একটি নৌকা ছিল। যখন ওই পাকসেনারা আসত তখন তাতে করে সবাই যেত। একদিন তাদের সামনে এসে ভিড়ল পাকসেনাদের নৌকা। তারা নৌকা ঘুরিয়ে নিয়ে দূর গ্রামে চলে গেল। পাকসেনারা চলে যাবার পর তারা গ্রামে ফিরে দেখল আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। মা তখন থরথর করে কাঁপছিল আর মনে মনে ভাবছিল এ যুদ্ধ কবে শেষ হবে। আমাদের গ্রামে এক হাজি ছিল। সে আগুন দেখে মারা গেল। আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তা ছিল। সেখানে একটি বাবলা

গাছ ছিল। মা সেখানে বসে দেখত কত লোক পাকসেনাদের ভয়ে ইন্ডিয়াতে চলে যাচ্ছে। তিনি দেখেছেন আর কেঁদেছেন।

সূত্র: জ-১১৭৬১

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
বুলবুলি খাতুন	**নুরজাহান বিবি**
কালিগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট	গ্রাম : মস্কিপুর, ডাক : পতিসর
১০ম শ্রেণি, রোল : ৪৩	উপজেলা : আত্রাই, জেলা : নওগাঁ
	বয়স : ৫১ বছর, সম্পর্ক : মা

কাঠের বাক্সে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের বন্দুক

আমাদের গ্রামের নাম বাহাদুরপুর। শ্রাবণ মাসের দুপুর বেলা পাকিস্তানি বাহিনী পতিসর গ্রাম হতে দুইটি পালতোলা নৌকা নিয়ে আমাদের গ্রামের দিকে আসতে থাকে। কিছু লোক তা দেখে সবাইকে জানিয়ে দেয়। তখন গ্রামের সকল মানুষ আমরা যার যার নৌকা তাই নিয়ে পালাতে চেষ্টা করি। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর নৌকা খুব দ্রুতগতিতে আমাদের গ্রামের দিকে আসে। আমরা খুবই ভীত হই। কিন্তু হঠাৎ করে নৌকার মাঝির হাল পড়ে যায়। নৌকা আমাদের গ্রামের কাছে আসে। ফলে নৌকা উঠে যায় উঁচু চরে। তারা সবাই অনেক কষ্টে নৌকা চর হতে নামায়।

আমরা কিছু দূর হতে সেই সব দৃশ্য অবলোকন করি। তারপর তারা সেই নৌকা নিয়ে আমাদের গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু আমাদের পাশের গ্রাম দমদত্তবাড়িয়ার একটি নৌকা পিছু পড়েছিল আর সেই নৌকা মুক্তিযোদ্ধাদের। সেই নৌকায় একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের কিছু বন্দুক, গুলি, বোমা ও পোশাক। পাকিস্তানি বাহিনী সেই নৌকাকে ঘিরে ফেলে। কিন্তু সেই নৌকায় যে ছয়জন ব্যক্তি ছিল তারা মুক্তিযোদ্ধা ছিল না। তারা ছিল সাহায্যকারী। ফলে তাদের বন্দুক চালানোর কোনো অভ্যাস ছিল না যার কারণে তারা আত্মসমর্পণ করে। পাকিস্তানি বাহিনী নৌকা পরখ করে সেই সব অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়। তারপর তারা তাদের ডাঙ্গায় তুলে এক লাইনে দাঁড় করায়। অতঃপর গুলি চালায়। তারই মধ্যে ইনছান নামক ব্যক্তি খুবই চালাক ছিল বলে তার শরীরে গুলিবিদ্ধ হবার আগেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির শরীরের রক্তে তার শরীর রাঙিয়ে একদম নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে। পাকিস্তানি বাহিনী তখন চলে যেতে উদ্যত হয়। ইনছান তা মাথা জাগিয়ে দেখতে চেষ্টা করলে পাকিস্তানিরা তাকে দেখে ফেলে এবং তাকে ধাওয়া করে বাহাদুরপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নির্মমভাবে হত্যা করে। তারপর তারা সেখান থেকে বিদায় নেয়।

২০০৭ সালে সেই জায়গাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বাহাদুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার।

সূত্র: জ-১১৭৬৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
রুবেল আলী	**মো. হাসান**
কালিগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট	গ্রাম : বাহাদুরপুর, পোস্ট : পতিসর
১০ম শ্রেণি, রোল : ০৬	থানা : আত্রাই, জেলা : নওগাঁ
	বয়স : ৪৮ বছর, সম্পর্ক : পিতা

আত্রাই রেল ব্রিজ ধ্বংস করে

আমার পিতার বয়স যখন ১৪ বছর তখন তিনি কালীগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনের অষ্টম শ্রেণিতে লেখাপড়া করতেন এবং সেই সময় শুরু হয় আমাদের দেশে মুক্তিসংগ্রাম। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ শুরু হয় যুদ্ধ এবং কিছুদিন পর আমাদের গ্রামের অনেকটা দূরে হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপিত হলো। সেবার অনেক বন্যা হয়। চারদিকে অনেক লোক মারতে থাকে তারা। সেই জন্য আমার বাবার দুই ভাই, তাদের বয়স ২৫ এবং ২৮ বছর, এই সকল অন্যায় অত্যাচার দেখে যুদ্ধে যাবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। তাদের আমার দাদা যুদ্ধে যেতে দেয় না এবং বলে যুদ্ধ না করে এ দেশের সেবা করা যায়। তাদের দুই জনকে ভারত পাঠিয়ে দেয় এবং আরেক ভাই আমার বাবা এ দেশে থেকে যায়। পাশের গ্রাম বাহাদুরপুরে হানাদার বাহিনী পাঁচজনকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং তারা আমাদের গ্রামে আসতে চেয়েছিল তবে সেদিন প্রচণ্ড ঝড়ের কারণে আসতে পারেনি। তারা তালিকা করেছিল আমাদের গ্রামের ঘরবাড়ি ভাঙবে। এই সময় একদিন আমাদের এলাকার আত্রাইয়ের রেল ব্রিজ দিয়ে হানাদার বাহিনীর ট্রেন যাচ্ছিল, তখন আমাদের এলাকার মুক্তিসেনারা সেই ব্রিজের ওপর হামলা করে ধ্বংস করেন।

সূত্র: জ-১১৭৭০

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
প্রবোধ কুমার শীল	**আতুল বুশার শীল**
কালিগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট	গ্রাম : হিঙ্গুলকান্দি, ডাক : পতিসর
১০ম শ্রেণি, রোল : ৩৪	থানা : আত্রাই, জেলা : নওগাঁ
	বয়স : ৫৪ বছর, সম্পর্ক : পিতা

দুইজন মহিলার ইজ্জতহানি করে

আমার নানা আমাকে বলেন, ১৯৭১ সালে রাজাকার ও আলবদররা একদিন পতিসর গ্রামে পাকবাহিনীকে নিয়ে আসে। পতিসর গ্রামে আসার পথে দমদত্তবাড়িয়ার এক পরিবারের তিনজন লোককে পাকবাহিনী ফসলের মাঠে গুলি করে হত্যা করে। তাদের হত্যা করার পর পাকবাহিনী পতিসর গ্রামে প্রবেশ করে এবং পতিসর গ্রামের অনেক ক্ষয়ক্ষতি করে। তারা পতিসর গ্রামের দুইজন মহিলার ইজ্জতহানি করে। গ্রামের অনেক লোক পানির মধ্যে দিয়ে মনিয়ারী গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পাকবাহিনী মনিয়ারী গ্রামের ভেতর দিয়ে যাওয়ার পথে খড়িপুকুর গ্রামের দুইজন লোককে গুলি করে হত্যা করে। যাদের হত্যা করে তাদের একজনের নাম মহাব্বত ও অন্য জনের নাম তমিজ। কছিমদ্দি নামের খড়িপুকুরের একজন লোককে আত্রাইয়ে ধরে নিয়ে যায়।

সূত্র: জ-১১৭৭৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. রয়েল আলী	**মো. আব্দুল জব্বার**
কালিগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট	গ্রাম : মনিয়ারী, পোস্ট : পতিসর
ষষ্ঠ শ্রেণি, রোল : ২৬	থানা : আত্রাই জেলা : নওগাঁ
	বয়স : ৭০ বছর, সম্পর্ক: নানা

বুঝলাম আমি বেঁচে আছি

তখন আমি ছিলাম যুবক। আমাদের গ্রামের সব হিন্দু পরিবার প্রাণভয়ে ভারতে গমন করল। কিন্তু আমার যাওয়া হলো না। আমার জিদ চাপল মরলে দেশের মাটিতেই মরব এবং হানাদার বাহিনীর দুই দশজনকে নিয়েই মরব। তারপর শুরু হলো নিরীহ বাঙালিদের প্রতি অমানবিক অত্যাচার। মা-বোনদের প্রতি নিপীড়ন। একা কী করব। আমার পাড়ার সবাই চলে গেছে, শুধু আমি একা, সেও আবার লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে হয়।

কিছুদিন পর মুক্তিযোদ্ধারা এসে গেল। এক দল মুক্তিযোদ্ধা আমাদের পাড়ায় এসে আমাদের বাড়িতে ঘাঁটি করে গেরিলা অপারেশন শুরু করল। ওদের মধ্যে আমার পরিচিত বন্ধুও ছিল। আমি কথা বলে ওদের সহযোগী হলাম। কোথায় পাকবাহিনী থাকত, কখন কোন মহলে যাওয়া-আসা করত আমি একটু একটু জানতাম এবং সেই মোতাবেক কাজ শুরু হলো। আমি অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যেই এ কাজগুলো করতাম। কিন্তু ভাগ্যে সইল না। একদিন ভোরবেলা আড়ালে আড়ালে পাঞ্জাবিদের প্ল্যান সংগ্রহ করতে গিয়ে গাড্ডায় পড়ে গিয়ে হাতে নাতে ওই পিশাচদের কাছে ধরা পড়ে গেলাম। মৃত্যু সুনিশ্চিত

ভেবে ঈশ্বরের ওপর সব ছেড়ে দিলাম। আমাকে এলোপাথাড়ি পিটাতে পিটাতে ক্যাম্পে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি আমার মতো আরও ১০-১৫ জন মৃত্যুপথযাত্রী হতভাগা নির্যাতনের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ওদের সামনে আমাকে আবারো নির্যাতন শুরু করে। সইতে না পেরে এক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। পরের দিন সকাল আটটায় ওই অবস্থায় আমাদের সবাইকে এক মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়ে লাইন করাল। আমি বুঝতে পারলাম মৃত্য নিশ্চিত। ঈশ্বরের নাম নিতে নিতে হঠাৎ করে বন্ধু মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মনে হলো। ওদের সঙ্গে কাজ করার সময়ে বলেছিল তোমাকে যদি কেউ গুলি করার প্রস্তুতি নেয় আর সেটা যদি তুমি জানতে পারো গুলি ছাড়ার মুহূর্তেই মাটিতে পড়ে গিয়ে মৃত্যুর ভান করে থাকতে পারলে বেঁচে যেতে পারো। এই বুদ্ধিটা আমার মাথায় এসে গেল। আমি লাইনে ১০ জনের পরে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর কমান্ডার প্রায় ৫-৭ হাত দূর থেকে গুলি করার প্রস্তুতি নিয়ে গুলি করল। তারপর একত্রে আর্তনাদ শুনতে পেলাম। বুঝলাম আমি বেঁচে আছি। একে একে পা দিয়ে গড়ায়ে বুটের পায়ে খুঁচিয়ে চেক করতে লাগল। আমার সামনের লাশটাকে এমনভাবে পদাঘাত করল সে উলট দিয়ে আমার শরীরের ওপর অর্ধেক চিত হয়ে পড়ল লাশটির পেটের ওপর এমনভাবে বুটের চাপ দিল সঙ্গে সঙ্গে পায়খানার রাস্তা দিয়ে ছিটকে পায়খানা বের হয়ে ওদের গায়ে পড়তেই অ্যাঁ অ্যাঁ করতে করতে চলে গেল। তার প্রায় ২০ মিনিট পর ভালো করে চোখ মেলে দেখি কোনো শব্দ নেই। ওরা চলে গেছে। এই সুযোগে হামাগুড়ি দিয়ে কিছুদূর এসে এক জমির জোলায় গড়িয়ে নামলাম এবং আস্তে আস্তে নিরাপদ স্থানে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। অবশেষে জ্ঞান ফিরে দেখি আমার পরিচিত মুক্তিযোদ্ধারা প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করছে। এভাবে ওদের সেবায় একটু সুস্থ হয়ে উঠি। তারপর এইভাবে প্রায় ৫-৬ মাস কেটে গেল।

হঠাৎ বিশাল বিপদ। ভোরে উঠে আড়াল থেকে দেখি আমাদের পাড়ার সব পথ পাকবাহিনী ঘিরে ফেলেছে। অনেক কষ্ট করে মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুদের খবর দিয়ে আমিও নিরাপদ স্থানে চলে যাই। সকালে পাকবাহিনী আমাদের বাড়িতে এসে পেট্রোল দিয়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে চলে গেল। যাওয়ার সময় যে খবর দিয়েছে তাকেও গুলি করে মেরে চলে যায়। পরে আমি বুঝতে পারলাম পরিচিত একজন আমাদের সঙ্গে থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করে সব তথ্য নিয়ে তাদের খবর দেয়।

তার এক মাস পরই দেশ স্বাধীন হয়।

সুত্র: জ-১৬০৮২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
পরশ কুমার হাজরা	**রবিন কুমার হাজরা**
নওগাঁ জিলা স্কুল	গ্রাম : বাহাদিমপুর, জেলা : নওগাঁ
৯ম শ্রেণি, খ শাখা, রোল : ০৩	সম্পর্ক : দাদু

ছদ্মবেশে দিনের বেলায় রেকি করলাম

রাজশাহীতে তখন অবস্থান করা নিরাপদ নয় মনে করে অনেক কষ্টে গ্রামের বাড়িতে চলে গেলাম। তারপর ভারতে পালিয়ে গেলাম এবং শরণার্থী ক্যাম্পে থাকি পরে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যুদ্ধের ট্রেনিং নিলাম। ট্রেনিং নেওয়ার পর আমাদের গ্রুপ কমান্ডারের নেতৃত্বে ভারতীয় বর্ডার পার হয়ে আমাদের দেশে এসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হই। প্রথমেই যুদ্ধ শুরু হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসর রাজাকারদের সাথে, পরে পাঞ্জাবি সৈন্যদের সাথে। রাতে আমরা কটকবাড়ি নামক গ্রামের এক মাস্টারের পরিত্যক্ত বাড়িতে গোপনে অবস্থান করতাম। ওই গ্রামের পাশ দিয়ে ছোট যমুনা নদী বয়ে গেছে। গ্রামের পশ্চিম দিকে দুই কি. মি. দূরে এক স্কুলে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প, সাথে রাজাকার বাহিনীও ছিল। আমাদের গ্রুপের কমান্ডার একদিন পরিকল্পনা করল ওই স্কুলে অবস্থিত হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের ওপর আক্রমণ করতে হবে। সে অনুযায়ী আমি ছদ্মবেশে দিনের বেলায় ওই স্কুলের আশপাশে রেকি করলাম অর্থাৎ দেখে এলাম কীভাবে আক্রমণ করলে তাদেরকে হত্যা করা যাবে। ওই রাতে সেখানে আমাদের গ্রুপের সব মুক্তিযোদ্ধা আক্রমণ করলাম। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গুরুতর আহত হলো। আমাদের আক্রমণের ভয়ে কয়েকজন রাজাকার পালিয়ে গ্রামের দিকে এলে তাদের মধ্য থেকে একজনকে আটক করে চোখ বেঁধে রাতে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন আস্তানায় নিয়ে আসা হলো এবং নদীর তীরে নিয়ে হত্যা করে ভাসিয়ে দেয়া হলো। রাইফেল দিয়ে তাকে গুলি করে মারা হলো না। কারণ গুলির শব্দ শুনে হয়তো হানাদার বাহিনী আবার আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে।

তার দুই দিন পর বদলগাছি নওগাঁ সড়কে মাইন পুঁতে রেখে পাকিস্তানি বাহিনীর গাড়ি উড়িয়ে দেওয়া হয়। এভাবে বিভিন্ন জায়গায় কখনো মাইন পুঁতে কখনো গ্রেনেড মেরে পাকিস্তানি সৈন্যদের ওপর আক্রমণ চালানো হলো। এভাবে আমরা মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী এক সাথে যুদ্ধ করে দেশ শত্রুমুক্ত করলাম এবং এভাবে সারা দেশ ১৬ ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত করা হয়।

কয়েকদিন পর আমরা সব মুক্তিযোদ্ধা নওগাঁয় তৎকালীন এসডিও অফিসে আমাদের অস্ত্র জমা দিই।

সূত্র: জ-১৬০৯১

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
আদনান সিদ্দিকী	**গোলাম রব্বানী**
নওগাঁ জিলা স্কুল	গ্রাম : চক এনায়েতপুর
ষষ্ঠ শ্রেণি, ক শাখা	ডাক ও জেলা : নওগাঁ
	বয়স : ৫৯ বছর

আব্দুল আলিম অনেক অত্যাচার করে

আমার গ্রামের পাশের ইউনিয়ন বিলাস বাড়ি। গ্রামের নাম হলুদ বিহার। নওগাঁ জেলার বদলগাছি থানার অন্তর্গত একটি ঐতিহাসিক বিহারের নাম অনুসারে গ্রামের নাম হলুদ বিহার। এই গ্রামে এক দরিদ্র ঘরে এক বীর সন্তানের জন্ম। তার পুরো নাম মোহাম্মদ মোকলেছার রহমান শাহাদাৎ হোসেন। তাঁর জীবনটা বড় কঠিন, ছেলেবেলায় বাবা-মা হারিয়ে এক মেম্বারের পরম দয়ায় সুসন্তান হিসেবে মানুষ হয়েছেন। সবেমাত্র ডিগ্রি পাস করেছিলেন। তার বাবা ময়েজ উদ্দিন মেম্বারের বড় আশা ছেলে একদিন বড় চাকরি করবে, তার সংসারের দায়িত্ব নেবে। সুখে ভরে দেবে তার ছোট সংসার। কিন্তু **১৯৭১** সালে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে ময়েজউদ্দীন মেম্বার শাহাদাৎ হোসেনকে যুদ্ধে যেতে অনুপ্রেরণা জোগালেন। শাহাদাৎ হোসেন দেশকে মায়ের উর্ধ্বে স্থান দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য ভারতে গেলেন। আওয়ামী লীগের আব্দুল জলিল ভাইয়ের সার্বিক সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধের ওপর ট্রেনিং নিয়ে দেশমাতৃকাকে রক্ষার জন্য অনেকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যুদ্ধে অনেক স্থান জয় করলেন। কিন্তু সেদিন ছিল **১৪** ডিসেম্বর **১৯৭১** সাল। বাংলার অনেক জায়গায় বিজয় পতাকা উড়ছে। আমাদের নিজ ইউনিয়ন ঐতিহাসিক কোলা ইউনিয়ন। তখনো পাকিস্তানি হায়েনারা দখল করতে পারেনি। কোলা দখল করতেই হবে এটা হায়েনাদের প্রতিজ্ঞা ছিল। বদলগাছি থেকে হায়েনার দল কোলা দখল করার জন্য মার্চ করে আসছিল। এ খবর পেয়ে শাহাদাৎ হোসেনের মুক্তিযোদ্ধার দল কালুপাড়া নামক ব্রিজের নিকট ঘিরে ফেলে। শাহাদাৎ হোসেন তার মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুর কথা উপেক্ষা করে রাস্তার ওপর স্টেনগান নিয়ে ব্রাশ ফায়ার করার জন্য উঠে পড়েন। পাশেই ছিল সরমজার আড়াল। সেইখানে লুকিয়ে ছিল একদল পাকিস্তানি হায়েনা। বিজয়ের নেশায় শাহাদাৎ হোসেন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে স্টেনগানের ট্রিগারে হাত দিতেই হায়েনার দল পেছন থেকে শাহাদাৎ হোসেনকে ঝাপটে ধরে ফেলল। শাহাদাৎ হোসেনকে হায়েনারা খোলা জিপে উঠিয়ে নিলে জয়পুরহাট অভিমুখে রওনা দিল। যেখানে রাজাকার আব্দুল আলীম অনেক অত্যাচার করে এবং তাকে পরাজয়বরণ করতে বলে। কিন্তু শাহাদতের চোখে মুখে ছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন। তাই সে সব সময় বলতো ইনশাহআল্লাহ আমার মাতৃভূমি স্বাধীন হবেই। রাজাকার আব্দুল আলীম তার মুখের স্বাধীন বাক্যকে স্তব্ধ করার জন্য খেজুর গাছের কাঁটা ডাল দিয়ে নির্মম অত্যাচার করে এবং শাহাদাৎ হোসেন শহিদ হন।

সুত্র: জ-১৬০৯৪

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মির্জা নূরনবী শুভ	**ইসকেন্দার মির্জা**
নওগাঁ জিলা স্কুল	গ্রাম : হলুদ বিহার, থানা : বদলগাছি
৮ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল : ৪৭	বয়স : ৬৪ বছর

রাইফেল চালাতে জানো

কালরাত্রি ২৫ মার্চ এলো। সারারাত গোলাগুলি। তখন আমি আর আমার বন্ধু প্রাচীর টপকে পালিয়েছিলাম। সেই বন্ধুটি তোমার আফজাল কাক্কু। আমরা যখন রাস্তায় উঠি তখন মিলিটারির ট্যাংক আসছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে তারা গুলি ছুড়তে লাগল। একটা গুলি এসে আফজালের হাতে লাগল। তখন আমি তাকে ভালো করে ধরে দৌড় দিলাম। কোথায় যাচ্ছি কিছু জানি না। পথে এক লোকের সাথে ধাক্কা খেলাম তারও একই অবস্থা। আফজালের অবস্থা খুবই খারাপ বাঁচবে কি না সন্দেহ। লোকটির সহযোগিতায় তার চেনা একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। আমি, আফজাল সেই লোকটি ও ডাক্তার চারজন মিলে উঠলাম এক পুরোনো বাড়িতে। তারপর তার সুস্থ হতে পুরো এক সপ্তাহ লাগল। আমাদের সাথে খাদ্য ছিল না। দুই-তিন দিন পর দেখলাম একদল লোক বাড়িটার সামনে দিয়ে যাচ্ছে। (আমরা যেখানে ছিলাম।) ঘরে আলো নেই বলে তারা আমাদের দেখতে পায়নি। আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। একটা ডাক দিলাম। তারা শব্দ শুনে উৎস খুঁজতে লাগল। মনে হলো তারা মুক্তিযোদ্ধা। আবার ডাক দিলাম। হাত নাড়লাম। এবার তারা আমাদের দেখতে পেল এবং আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াল। আমাদের অবস্থা নাকাল। তাদের ঘাড়ে ভর দিয়ে ক্যাম্পে এলাম। আমাদের খাবার ব্যবস্থা হলো। তখন কমান্ডার সাহেব বললেন– যুদ্ধ করতে পারবে? বললাম, পারব। বললেন, রাইফেল চালাতে জানো? বললাম- একটু একটু। তবে কয়েক দিন অনুশীলন করলে ঠিকই পারব। আমাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো। এরপর–১৪ মে, আমাকে অপারেশনে যেতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন। ছোট ক্যাম্প আক্রমণ করতে হবে। জঙ্গল পেরিয়ে এগোতে থাকলাম, আমার কাছে বুলেট রাইফেল ছাড়াও কয়েকটি গ্রেনেড ছিল। আমার বন্ধুর কাছে ছিল কেরোসিন। রাত বারোটা। দেখলাম নাক ডাকার শব্দ আসছে। চারজন ক্যাম্প টহল দিচ্ছে। আমি আরো তিনজন সেই দিকে গিয়ে চারজনকে মুখে রুমাল বেঁধে চাকু দিয়ে মারলাম। অপারেশন শেষে ক্যাম্পে ফিরলাম। সেদিন রাতে কমান্ডার বললেন, ছোট ক্যাম্প উড়িয়ে দেওয়ায় পাঞ্জাবি ক্ষেপে গেছে। এবার বড় ক্যাম্প উড়াবার প্ল্যান করতে হবে। তিনি আমাকে ও আমার সহকারীদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন।

১৮ জুলাই তার নির্দেশে আমরা রাস্তার ধারের ঝোপে লুকিয়ে থাকলাম। রাস্তার দুই পাশে অপেক্ষা করছি। পাঞ্জাবিরা গাড়ি নিয়ে এদিকে আসছিল। দুটি অস্ত্র ভর্তি গাড়ি। টেলিফোনে কথা বলে আমরা উত্তর-দক্ষিণ থেকে এক সাথে আক্রমণ করলাম। দুই দিক থেকে আক্রমণে কোণঠাসা হয়ে পড়ল পাকিস্তানিরা। সবাই মারা গেল। আমরা গাড়ি থেকে অসংখ্য গ্রেনেড, রাইফেল, বুলেট, কামানের শেল উদ্ধার করলাম। তাদের অবস্থা চরমে উঠল। তারপর অস্ত্র নিয়ে ফেরার পথে অতর্কিতে এক প্লাটুন হানাদার আমাদের আক্রমণ করল। আমরা পাল্টা আক্রমণ করলাম। আমার পায়ে হঠাৎ একটি গুলি লাগল। আমি পা

চেপে রইলাম। আফজাল বলল, দোস্ত বেশি পাঞ্জাবি নেই। আমি দাঁড়িয়ে সবগুলোকে খতম করি। বললাম– না। সে বলল, দেখই না। বলে সে যেই দাঁড়াতে গেল তখনি একটি বুলেট তার বুকে লাগল। সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। তাকে সমাহিত করলাম কাছের বাঁশের ঝাড়ে।

জ-১৬১০২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. মাছুম দেওয়ান	**মো. আনিসুর রহমান তরফদার**
নওগাঁ জিলা স্কুল	গ্রাম : চকদেব তরফদারপাড়া
৭ম শ্রেণি, খ শাখা, রোল : ১০	জেলা : নওগাঁ
	বয়স : ৬৩ বছর, সম্পর্ক : বড় আব্বা

ছাত্রদের রাগ বেশি

আমাদের গ্রামের নাম রামনারায়ণপুর। এই গ্রামটি নওগাঁ জেলার বদলগাছি থানায় অবস্থিত। তখন আগস্ট মাস। একদিন হঠাৎ পাকবাহিনী আমাদের গ্রামে এলে সবাই মৃত্যুর ভয়ে পালাতে শুরু করল। আমি যার কাছ থেকে ঘটনাটি শুনে লিখেছি তিনি আমার নানাজি। তিনি তখন ছাত্র ছিলেন। পাকবাহিনীর প্রতি ছাত্রদের রাগ বেশি। এই কারণে তিনিও গ্রামের উত্তর দিকে মাঠের এক জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। এদিকে তার বাড়িতে এবং গ্রামের বাড়িগুলোতে পাকবাহিনী ঢুকে তল্লাশি করতে লাগল কোথাও মুক্তিবাহিনী লুকিয়ে আছে কি না। এভাবে প্রায় দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হলো। তখন বেলা প্রায় ডুবে যাচ্ছে। গ্রামের পূর্ব দিকে নওগাঁ থেকে ধামইরহাট আমাদের বড় রাস্তায় ব্রিজ পাহারা দেওয়ার কথা বলে গেল। সেই থেকে গ্রামের সবাই ৫-৬ জন সেই রাতে ব্রিজ পাহারা দিচ্ছিল। হঠাৎ রাত দুইটার দিকে বিকট শব্দ করে মাইন বাস্ট হওয়ার শব্দ হলো। সব লোক প্রাণের ভয়ে মাঠের মধ্যে ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে প্রাণ নিয়ে দৌড়ে পালাল। কে কীভাবে গেল তার বর্ণনা দেয়া যাবে না। কারণ তখন মাঠে পানি ছিল। পরের দিন চকপ্রসাদ এলো পাকবাহিনী। গ্রামে ঢুকতেই রহিম উদ্দীন নামে এক যুবক দেখে তাকে ধরে জিজ্ঞাসা করছে, তুম কোন হ্যায়? তখন লোকটি বলল, আমি মুক্তি নেহি হ্যায়। হাম বাঙালি হ্যায়। মুসলিম হ্যায়। এত কথা বলার পরও লোকটিকে তারা চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে গেল, কাশিপাড়া ক্যান্টনমেন্ট। সেখানে তাদের ঘাঁটি ছিল। রাতে দুটি রুটি খেতে দিয়েছিল এবং মাঝ রাতে ৮-১০ জন পাকসেনা এসে তাকে গুলি করার কথা বলে গেল। রহিমউদ্দিনের চোখে কাপড় বেঁধে গাংরা গ্রামের বংকুর ছেলে আশরাফুল রাজাকারকে হুকুম দিল গুলি করতে। আশরাফুল রহিমউদ্দিনকে নিয়ে বর্তমানে কাশিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পশ্চিম

বধ্যভূমিতে নিয়ে আসে এবং সেখানে একটি ঘরে রহিমউদ্দিনকে রেখে তারা অপেক্ষা করছিল। এমন সময় ভীষণ বৃষ্টি শুরু হলো এবং ঝড়। ঝড়ের দাপটে গাছপালা উপড়ে পড়ছে আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আকাশে। এক ঘরে প্রায় ১৫-২০ জনকে ধরে এনেছিল। তারা ঘরের জানালার রড ভেঙে পালাবার ফন্দি করল এবং রড ভেঙে পালাতে পারল। আর যে কয়জন লোক ছিল তাদেরকে রাতে পাকসেনা ও রাজাকার বাহিনী হত্যা করল। রহিমউদ্দিনের বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। তাকেও গ্রামে পাওয়া গেল না প্রায় তিন দিন ধরে। পরে তিনি যখন গ্রামে এলেন এবং বিস্তারিত ঘটনার বর্ণনা দিলেন। তা শুনে সবাই হতবাক হয়ে পড়লেন।

সূত্রঃ জ- ১১২৫৯

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সানজিদা আফরিন মৌ	**মো. মামুন রশিদ**
শংকরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	রামনারায়ণপুর
দশম শ্রেণি	বয়স : ৫৫ বছর, সম্পর্ক : নানা

তার মেয়ে পালাতে পারল না

যখন যুদ্ধ হয় তখন আমার বয়স ছিল ৩০ বছর। সেই দিন আমি আমাদের গ্রামের একজনের ঘর মেরামতের কাজ করছিলাম। হঠাৎ একটি ছেলে এসে আমাকে জানাল যে, আমাদের গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনী প্রবেশ করেছে এবং সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই শেষ করে দিচ্ছে। একথা শুনে আমি বাড়ি গেলাম। বাড়ি গিয়ে আমার পরিবারের সকলকে গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রবেশের কথা জানালাম এবং সাবধানে থাকতে বললাম। আমাদের গ্রামে সিরাজ মিয়া নামক একটি লোক ছিল। পাকিস্তানি বাহিনী দেখে সিরাজ মিয়া ঘরে গিয়ে লুকালো। তার একটি মেয়ে ছিল। তার মেয়ে পালাতে পারল না। ফলে পাকিস্তানি বাহিনী তার মেয়েকে ধরে ফেলল। তাদের হাত থেকে মেয়ের জীবন রক্ষার জন্য সে ঘর থেকে বের হয়ে এসে পিছন থেকে পাকিস্তানি সৈন্যকে চেপে ধরে। ফলে তার হাত ফসকে সিরাজ মিয়ার মেয়ে পালিয়ে যায় এবং তারা সিরাজ মিয়াকে ধরে নিয়ে যায়।

আমাদের পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে এই রকম আরও একটি ঘটনা ঘটেছে। মজির নামক একটি লোক গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনী প্রবেশ করতে দেখে ভয়ে দৌড়ে ঘরে লুকাল। তার একটি পুত্রবধূ ছিল। মজির মিয়ার পুত্রবধূটি পালাতে চেষ্টা করেও পারল না। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাকে ধরে ফেলল। তার পুত্রবধূকে ধরতে দেখে মজির মিয়া ঘর থেকে বের হয়ে এলো। মজির মিয়াকে দেখে পাকিস্তানি বাহিনী তার পুত্রবধূকে ছেড়ে দিল এবং

তাকে ধরে নিয়ে গেল। নিষ্ঠুর পাকিস্তানি বাহিনী সিরাজ মিয়া ও মজির মিয়াকে এক জায়গায় নিয়ে দুজনকে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৯৭১ সালের সেই সব ঘটনা আমার আজও মনে পড়ে। সেই সব ঘটনা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

সূত্র: জ-১১৭৯২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
আলফা খাতুন	**মো. সমসের আলী**
ভবানীপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : ডিমা
৮ম শ্রেণি, রোল : ২	বয়স : ৬৫ বছর

পরীক্ষা দেয়া হলো না

আমি ১৯৭১ সালে নওগাঁ ডিগ্রি কলেজে বিএ ক্লাসে পড়তাম। থাকতাম নওগাঁ কালিতলা নানির বাড়িতে। বিহারি আর মিলিটারিরা নওগাঁর আনাচ-কানাচে লুটতরাজ আর মারপিট শুরু করে। পরীক্ষা দেয়া হলো না। চলে এলাম গ্রামের বাড়িতে। কিন্তু হায়! এখানে এসেও শান্তি নেই। রাজাকারদের দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা বলে যাকে-তাকে ধরে নিয়ে যেতে লাগল। বিহারি ছাত্ররা আমাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত। বাঙালি বলে ভয়ে কিছু বলার জো ছিল না। ক্রমে যতই দিন যেতে লাগল ততই মিলিটারিরা বাড়িঘরে আগুন দিয়ে পোড়াতে লাগল। বৃদ্ধদের অপমান আর নারীদের অমর্যাদা করতে লাগল। সেদিন রবিবার। বেলা বারোটার দিকে কুশা নামে একজন শ্রমিক আমাদের পাড়া থেকে বাড়ি যাচ্ছিল। তার বাড়ি আয়াপুরে। সে যখন বৈলশিং ইবতেদায়ি মাদ্রাসার কাছে তখন দুজন মিলিটারি মাঠ থেকে উঠে এসে কিছু বোঝার আগেই তাকে গুলি করে। গুলির শব্দ শুনে আমরা এগিয়ে গেলাম। দেখলাম পিঠের এপাশ দিয়ে ওপাশে গুলি চলে গেছে। সে কী ভয়ানক দৃশ্য। সে রাতে আমাদের গ্রামের হিন্দুরা ভারতে পালিয়ে গেল। রাজাকারেরা হিন্দুদের বাড়ি লুট করে নিয়ে গেল ধান, চাল, গরু ইত্যাদি। রাজাকারেরা গরু-ছাগলের মাংস রান্না করে পাকসেনাদের খাওয়াত ও নিজে খেত। আমি আমার পাড়ার লোকদের সাথে মনোহরপুর বিলের ধারে বাঁশঝাড়ে লুকিয়ে থাকতাম সারাদিন। পরে বর্বর পাকসেনাদের খবর নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতাম।

একদিনের ঘটনা, বেলা দশটার দিকে শুনলাম রাজাকারেরা মনোহরপুরে মিলিটারি নিয়ে এসেছে। বেলা বারোটার দিকে গুলির শব্দ শুনলাম। খবর পেলাম ছাতরার বিল থেকে কিছু জেলে আর স্থানীয় কিছু নিরীহ লোককে পাকসেনারা লাইন করে গুলি করেছে। ভয়ে ভয়ে বেলা তিনটার দিকে সেখানে গিয়ে লাশগুলো দেখি স্বচক্ষে। ১৯ জনের রক্তাক্ত লাশ!

কী নির্মমভাবে এই নিরীহ লোকদের হত্যা করল। কাঁদতে কাঁদতে সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফিরে এলাম।

আমার আব্বা যখন কথাগুলো বলছিলেন তখন তার চোখ থেকে পানি ঝরছিল, দেখে আমিও অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না।

সূত্র: জ-১১৭৩০

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সাজেদুল ইসলাম	**মো. আব্বাস আলী**
বৈদ্যপুর হাই স্কুল	সিনিয়র শিক্ষক, মান্দা
দশম শ্রেণি, রোল : ০৮	বয়স: ৫৯ বছর, সম্পর্ক: বাবা

মেয়েটি আর ফেরে না

হাবিল উদ্দিন প্রামাণিক তিনি একজন চাকরিজীবী মানুষ। একদিন তিনি অফিসে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি লোকজনের মুখে শুনলেন যে, পাকিস্তানি বাহিনীর গাড়ি এদিকে আসছে বলে অনেক লোক ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তিনি সেখানেই ছিলেন। ঠিক তখনি গাড়িটি এসে পড়ে। তিনি তখন ভয়ে কাঁপছিলেন। তার কাছে একটি সাইকেল ছিল। পাকিস্তানি বাহিনী তার কাছ থেকে সাইকেলটি কেড়ে নিল। তারপর সাইকেল নিয়ে থানার মধ্যে রেখে দিল।

তিনি খুব সাহসী লোক ছিলেন। তাই তিনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে থানার ভেতরে চলে গেলেন। তিনি সাইকেল চাইতেই পাকিস্তানি সৈন্যরা তার ওপর রেগে যায়। পরে তাকে হামাগুড়ি দিয়ে দশ হাত যেতে হয়, তারপর তাকে সাইকেল দিল। তিনি যখন বাড়ি ফিরতে লাগলেন তখন আবার তাকে ডেকে নিয়ে টাকা-পয়সা সবকিছু কেড়ে নিল। তিনি বাড়িতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিছু খেতে বা কোনো কাজ করতে পারলেন না।

কিছু দিন পরের ঘটনা। তার পরিবারে ছিল বৃদ্ধ বাবা-মা, এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়েটি বড়। বয়স আট বছর। ছেলের বয়স পাঁচ বছর। একদিন রাতে সবাই ঘুমিয়ে ছিল। এমন সময় পাকিস্তানি বাহিনী তাদের ওপর আক্রমণ করল। তিনি বৃদ্ধ বাবা-মাকে রেখে ছেলেমেয়েকে নিয়ে পালাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু ভুলে শুধু ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যান। একটু পরে পাকিস্তানি বাহিনী বাড়িতে প্রবেশ করে। বৃদ্ধদের অনেক প্রশ্ন করে। তারা তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিলে তাদেরকে মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখায়। পাকিস্তানি বাহিনী ঘরে প্রবেশ করে সেই মেয়েকে দেখতে পায়। তারা সেই মেয়েটিকে বাইরে নিয়ে যায়। তারপর হাত ভেঙে দেয় এবং চলে যায়।

পরে ওই লোক বাড়িতে এসে দেখে তার মেয়ের হাত ভাঙা। এর দুই দিন পরে মেয়েটি বাড়ি থেকে বাইরে যায়। আর বাড়িতে ফিরে আসে না। তার বাবা-মা এখনও জানে না তার মেয়ে বেঁচে আছে না মরে গেছে। তারা তাদের ছেলেকে নিয়ে এখনও জীবনযাপন করছেন। আর সেই ছেলেটি হলেন আমার আব্বু। তারা আমার দাদু ও দাদিমা। ১৯৭১ সালে দাদা-দাদি তাদের মেয়েকে হারিয়ে খুব দুঃখ পেয়েছেন।

সূত্র: জ- ১১৭৫০

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
শামীমা আক্তার শিখা	**হাবিল উদ্দিন প্রামাণিক**
মান্দা এস.সি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স : ৭০ বছর
নবম শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ	

শুধু ছিল পাকবাহিনীর বাংকার

১৯৭১ সালে যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন আমার বাবার বয়স ছিল ১৪ বছর। তারা যে গ্রামে বাস করত সে গ্রামের নাম ছিল হাসামদিয়া এবং গ্রামটি ছিল শহরমুখী ও শান্তিপূর্ণ। হঠাৎ সারা দেশে যুদ্ধের আলোড়ন সৃষ্টি হলো। তখন আমার ঠাকুরদাদা ছিল বরিশালে। যুদ্ধের খবর পেয়ে ছুটিতে বাড়ি আসেন । তিনি বাড়িতে আসামাত্র জানতে পারলেন যে, আগামীকাল পাকবাহিনী সেই গ্রামে আসছে। ওই মুহূর্তে তিনি তার পরিবার নিয়ে চলে যান এক আত্মীয়ের বাড়ি। তিনি ওখানে তাদের রেখে ওই রাতেই চলে আসেন বাড়িতে। ভয়ে ভয়ে তিনি রাত কাটান। তারপর ভোর হতেই তিনি শব্দ পেলেন। বাইরে এসে দেখেন ব্রিজের ওপরে আকাশে দুটি হেলিকপ্টার ঘুরছে। হেলিকপ্টারটি চলে যায় এবং আধ-ঘণ্টা পরই গুলির শব্দ পেয়ে বাইরে ছুটে আসেন। তিনি আড়াল থেকে দেখেন যে রাস্তার ওপর চারটি মেশিনগান সেট করা তার বাড়ির দিকে। ওই দেখে বাড়ির পূর্ব দিকের বাগান দিয়ে দৌড় দিতেই গুলি শুরু হয় এবং একটি গুলি তার দুই পায়ের মধ্য দিয়ে চলে যায়। তিনি প্রাণের ভয়ে গাছের আড়াল দিয়ে দৌড়াতে থাকেন। তিন কিলোমিটার দৌড়ে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে ওঠেন। তিনি পেছন ফিরে দেখলেন যে, হাজার হাজার মানুষ গ্রাম ছেড়ে যাচ্ছে। গুলির শব্দ আর ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। তা দেখে তিনি হতবাক হন এবং কাঁদতে থাকেন। কারণ তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক। হঠাৎ পাকবাহিনী চারপাশ ঘিরে তাকে ধরে ফেলে। তাকে গুলি করার জন্য বেছে নেয়। কিন্তু কিছু মুসলমান লোক তাদের বলেন যে, তিনি মালায়ন নেহি হে, এ মুসলিম হে। তখন তাকে ছেড়ে দেয়। তার পাশে কিছু হিন্দুবাড়ি ছিল। সেগুলো আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে। তিনি সেই সুযোগে পরিবারের কাছে চলে যান। পরিবারকে দেখে তিনি গ্রামে ফিরে আসতেই দূর থেকে দেখতে পান তার

ঘর গাছ-গাছালি কিছুই নেই। শুধু ছিল একটি পাকবাহিনীর বাংকার। ওই দেখে তিনি আবার চলে যান পরিবারের কাছে। তিনি প্রাণের ভয়ে তাদেরকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যান। শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়া খেয়ে চলে যান আখের জমিতে। সেখানে সকলে মিলে দুই রাত কাটান। সকাল হতেই তারা সিদ্ধান্ত করেন যে, এদেশে আর থাকা যাবে না। তারপর তারা রওনা হন ভারত সীমান্তের পথে। ভারত পৌঁছাতে তাদের চারদিন লেগেছিল। পাঁচ মাস পর রেডিওতে জানতে পারলেন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এ খবর পাওয়ার পর তারা পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। এমনকি দুই-তিন দিন না খেয়েও দিন কেটেছে। অনেক কষ্টের পর তারা সুখের আলো দেখতে পেয়েছেন।

সূত্র: জ- ১১০৮৭

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
অনিতা মণ্ডল	**বাবা**
পুইয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	
৯ম শ্রেণি, রোল : ৪৫	

লোকটি শুধু কাঁদছিল

একদিন আমরা বসেছিলাম। তখন হঠাৎ দেখি পাকিস্তানি দল গাড়ি নিয়ে আসছে। দেখামাত্র সবাই ছোটাছুটি করতে লাগলাম। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে আমি ভারতে আর্মির ট্রেনিং করছিলাম। তারপর আমি ভারত থেকে ফিরে আসার সময় দেখি আমাদের এই অঞ্চলে গোলাগুলি শুরু হয়েছে। আমি ভাতকাড়ার মোড়ে হেঁটে আসার সময় পাকবাহিনী আমাকে ধরে ফেলল। তারা আমার হাতে অস্ত্র তুলে দিল। তারপর একজন ব্রিজের নিচে চলে গেল। আরেকজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি ফৌজ হে। তখন আমি বললাম, হাম ফৌজ নেহি হে। তখন তারা আবার আমাকে খঞ্জনপুর বাজারে নিয়ে গেল। আমি সকল প্রশ্নের উত্তর জেনেও না জানার ভান করেছিলাম। খঞ্জনপুরে অনেক বিহারি ছিল। তাই তারা আমাকে ছেড়ে দিল। তারা তখন সত্যিই মনে করল যে, আমি মুক্তিযোদ্ধা নই। শক্তিশালীও নই। তখন আমি তাদের হাত থেকে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলাম।

আবার আমি ভাতকাড়ার রাস্তা দিয়ে আসছিলাম। তখন দেখলাম যে, পাকবাহিনী এক হিন্দু গরিব লোককে রাজাকারদের বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। তারপর হিন্দু লোকটিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে অন্য জায়গায় চলে গেল। লোকটি শুধু কাঁদছিল। লোকটিকে দেখে আমার মায়া জাগল। তাই আমি ও আমার সহপাঠীরা তার বেঁধে রাখা হাতের দড়ি খুলে

দিয়ে পালিয়ে বাড়িতে এলাম। সেই হিন্দু লোকটি কোথায় পালিয়ে গেল আমরা তা জানি না।

সূত্র: জ-১১২৫২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
নাদিরা খাতুন	**মো. ইদ্রিস আলী**
তেঘরিয়া দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : তেঘরিয়া, থানা : সাপাহার
ষষ্ঠ শ্রেণি, রোল : ৩৪	জেলা : নওগাঁ
	বয়স : ৪৫ বছর, সম্পর্ক : বাবা